www.bari.gov.bd

মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতায় জৈব পদার্থ

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতায় জৈব পদার্থ

রচনায়

ড. হাবিব মোহাম্মদ নাসের
ড. মুহাম্মদ মাসুদুজ্জামান মাসুদ
ড. মোছা. রোকেয়া খাতুন
ড. মোছা. মারুফা সুলতানা
ইবনে সালেহ মো. ফরহাদ

সম্পাদনায়

ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী
ড. দীদার সুলতানা
মো. হাসান হাফিজুর রহমান

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশনায়
মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
জননী প্রিন্টার্স
১০৫ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: jprinters15@gmail.com

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

জৈব পদার্থকে মাটির জীবন বলা হয়। মাটির জৈব পদার্থ সাধারণত মাটির ভরের মাত্র ১-৫% নিয়ে গঠিত কিন্তু মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ ইহা মাটির বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতার উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। কার্বন হলো মৃত্তিকা জৈব পদার্থের প্রধান উপাদান যা উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির অন্যতম বৃহৎ ভাণ্ডার এবং মাটির গঠন ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটিতে কার্বনের উপস্থিতির সাথে অনুজীবের বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে তাই মাটির কার্বন একটি মহামূল্যবান সম্পদ। মাটির জৈব পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে এবং বেশিরভাগ মাটিতে সিইসি এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এছাড়াও জৈব পদার্থ মাটির বিষাক্ত যৌগ গুলিকে আবদ্ধ করতে পারে, ফলশ্রুতিতে উদ্ভিদের শিকড় অঞ্চলে মাটির বিষাক্ততা হ্রাস করে এবং মাটির আর্দ্রতাসহ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক সুবিধা প্রদান করে। এমনকি জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ অম্লীয় মাটিও পর্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ভিদ পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে। জৈব পদার্থ সামগ্রিকভাবে, ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক গুণাবলী উন্নত করে। মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার পরিবর্তন নির্ভর করে কতটা নিবিড় ভাবে জমি ব্যবহার করা হয়, ফসল দ্বারা পুষ্টি যোগ করা হয় এবং অপসারণ করা হয়। প্রতিনিয়ত ভূমি ব্যবহার এবং পরিমিত জৈব সার প্রয়োগ না করায় দিনে দিনে মাটির কার্বন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে পরিমিত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেও ভাল ফসল উৎপাদন হচ্ছে না। এই পুস্তিকাটি বাংলাদেশের মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতায় জৈব পদার্থের ভূমিকা মূল্যায়নের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করা হলো যা গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষি সম্প্রসারণকর্মী, এনজিওকর্মী এবং চাষী ভাইদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং মৃত্তিকা সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়তা করবে।

ড. দেবাশীষ সরকার

ভূমিকা

মাটির উর্বরতা বলতে সাধারণত মাটিতে ফসলের অত্যাবশ্যকীয় সকল পুষ্টি উপাদান যেমন: নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার, জিংক, বোরন ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকা বুঝায়। জমির উর্বরতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন- ভূমির শ্রেণি, মাটির প্রকার, মাটির গঠন ও প্রকৃতি, মাটির পিএইচ তথা অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব, মাটির জৈব পদার্থ, মাটির অনুজৈবিক কার্যাবলী, ফসল ও সার ব্যবস্থাপনা এবং পানির ব্যবস্থাপনা অন্যতম। মাটি গঠনের মূল উপাদানের মধ্যেই মাটির উর্বরতা তারতম্য রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবেই কোন কোন মাটি বেশি উর্বর আবার কোন কোন মাটি কম উর্বর । ভূমি শ্রেণি অর্থাৎ উঁচু, মাঝারী উচু, নীচু, অতি নীচু জমির কারণেও জমির উর্বরতা পার্থক্য হয়ে থাকে। সাধারণত উঁচু জমি কম উর্বর এবং নীচু জমি বেশি উর্বর হয়ে থাকে। মাটির প্রকার অর্থাৎ বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এটেল মাটির মধ্যেও উর্বরতার পার্থক্য রয়েছে। বেলে মাটির চেয়ে দোআঁশ ও এটেল মাটি বেশি উর্বর। মাটির পিএইচ তথা অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব দ্বারা মাটির উর্বরতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। অধিক অম্লত্ব বা অধিক ক্ষারকত্ব বিশিষ্ট মাটি কৃষি কাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। এসব মাটিতে ফসলের খাদ্য উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্বেও তা ফসলের গ্রহনোপযোগী আকারে থাকে না এবং ফসল তা গ্রহণ করতে পারে না। মৃদু অম্লত্ব থেকে নিরপেক্ষ মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। একটি উর্বর কৃষি জমিতে শতকরা ২.৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে শতকরা ১.৫ ভাগেরও কম জৈব পদার্থ রয়েছে। জৈব পদার্থ ফসলের পুষ্টি উপাদানের গুদাম ঘর হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈব পদার্থ মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ও মাটির উপকারী অণুজীবের কার্যকলাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাটিতে বিদ্যমান খাদ্য উপাদানকে ফসলের গ্রহণ উপযোগী আকারে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। ফলে মাটির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মাটির জৈব পদার্থ পরিবর্তনশীল বিধায় এ দিকে সবসময় বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়াও ফসল, সার ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা প্রভাবিত হয়। শস্য বিন্যাস ও ফসলের বহুমুখীকরনের মাধ্যমেও মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন- শস্য বিন্যাসে সবুজ সার ফসল ও ডাল জাতীয় ফসল চাষের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।

জৈব পদার্থ ও মাটির উর্বরতা

দীর্ঘমেয়াদী মাটির উর্বরতা বজায় রাখার অন্যতম মূল চালিকা শক্তি হলো মাটির জৈব পদার্থ যা মাটির বিপাকীয় শক্তির ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে এবং পুষ্টির প্রাপ্যতায়

জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। পৃথিবীতে কার্বনের (C) বৃহত্তম ক্ষেত্র মাটি, যেখানে ১ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১৫০০ পেন্টাগ্রাম (১ Pg = $১০^{১৫}$ g) C সঞ্চয় করে যা বায়ুমন্ডলের (৭৫০-৯৫০ Pg C) দুই গুণ বেশি এবং মোট গাছপালা (৬০০ Pg C) থেকে দুই গুণ বেশি। ৫০ বছরের সংগৃহীত ডাটা থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী কৃষি কাজে জমি ব্যবহারের কারণে উপরের ২ মিটার মাটি থেকে ১৩৩ Pg C হারিয়েছে। সাধারণত নীচু স্তরের মাটি থেকে উপরি স্তরের মাটিতে এবং সূক্ষ ও মাঝারি থেকে মোটা দানার মাটিতে বেশি পরিমান কার্বন থাকে। নিবিড় চাষ, ভূমিক্ষয়, অপরিমিত সার প্রয়োগ এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় কৃষি মাটিতে নিম্ন স্তরের (১ শতাংশের কম) জৈব কার্বন (SOC) রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান ১.৫ শতাংশের নীচে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১ শতাংশেরও কম। গবেষণায় দেখা গেছে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও বরিশালের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে পর্যাপ্ত রয়েছে। এক সময় এদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার জৈব পদার্থের উপস্থিতি ছিল এবং সিলেট, মৌলভীবাজার, যশোর ও নড়াইল জেলার মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ তুলনামুলক বেশী ছিল। তবে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও, রংপুর, গাইবান্ধা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় জৈব পদার্থের পরিমাণ কম লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং চট্টগ্রাম জেলায় অরণ্য বনভূমির কারণে মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ ছিল। খুলনা জেলার লবনাক্ত রুপসা থানার মৃত্তিকাতে জৈব কার্বনের পরিমান ০.৪০ শতাংশ থেকে ২.৫৮ শতাংশ পর্যন্ত এবং পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় ০.৫১ শতাংশ থেকে ০.৬৪ শতাংশ এবং উচ্চমাত্রায় উপরিস্তরের মৃত্তিকায় দেখ যায়। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, মৃত্তিকা প্রোফাইলের গভীরতার কারণে জৈব কার্বন কমেছে ০.৩ শতাংশ থেকে ১.৫৮ শতাংশ পর্যন্ত। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ মাটির জৈব কার্বন কমেছে ০.২৯ শতাংশ থেকে ০.৮৯ শতাংশ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, মধুপুর অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ সাধারণভাবে কম (২ শতাংশ) ছিল। সেচহীন এলাকার তুলনায় সেচযুক্ত এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশী জৈব পদার্থ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মাটির সিরিজের জৈব পদার্থ ০.৮৬ শতাংশ থেকে ৪.৯৯ শতাংশ পর্যন্ত এবং গড় জৈব পদার্থের পরিমাণ ছিল ২.০৯ শতাংশ। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় জৈব পদার্থের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে যা মাটির গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। মাটির জৈব পদার্থ মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। জৈব পদার্থ মিনারেলাইজেশনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অবমুক্ত করে। এছাড়াও মাটির অম্লত্ব এর দ্রুত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাফার হিসেবেও কাজ করে। এটি ফসলের

জন্য পুষ্টির আধার হিসাবে কাজ করে, সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বাড়ায়। এছাড়াও মাটির পুষ্টির বিনিময় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (CEC-মূলত Ca, Mg ও K), পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, মাটিতে বায়ুচলাচল বৃদ্ধি করে, মাটির কম্প্যাকশন কমায় এবং উদ্ভিদের খাদ্য সরবরাহ করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ ছাড়া রাসায়নিক সার দিয়ে মাটির উর্বরতা বজায় রাখা যায় না। জৈব পদার্থ রাসায়নিক সারের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ায়। তাই মাটির জৈব পদার্থকে মাটির জীবন বলা হয়। একটি ভাল মাটিতে ২.৫ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকা উচিত। মাটির জৈব পদার্থের অবক্ষয় বাংলাদেশের উচ্চ ফসল উৎপাদনের জন্য একটি বড় বাধা। মাটির জৈব পদার্থ ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং মাটির উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে নিয়মিত জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। মাটির জৈব পদার্থের প্রধান উৎসের মধ্যে রয়েছে ফসলের অবশিষ্টাংশ, পশুর বর্জ্য, খামারের বর্জ্য, গার্হস্থ্য বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, নর্দমা বর্জ্য, সবুজ সার ইত্যাদি। তাছাড়া জৈব পদার্থের উৎস হিসাবে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, বায়োগ্লারী, কম্পোস্ট এবং ভার্মি-কম্পোস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে সারা দেশে আবাদযোগ্য জমির প্রায় ০.৭৬ মিলিয়ন হেক্টর খুব কম জৈব পদার্থসমৃদ্ধ এবং ২.৮৮ মিলিয়ন হেক্টর কম জৈব পদার্থসমৃদ্ধ ছিল যেখানে দেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৭.৯৪ মিলিয়ন হেক্টর যা আবাদযোগ্য জমির ৩০ শতাংশ (চিত্র-১)।

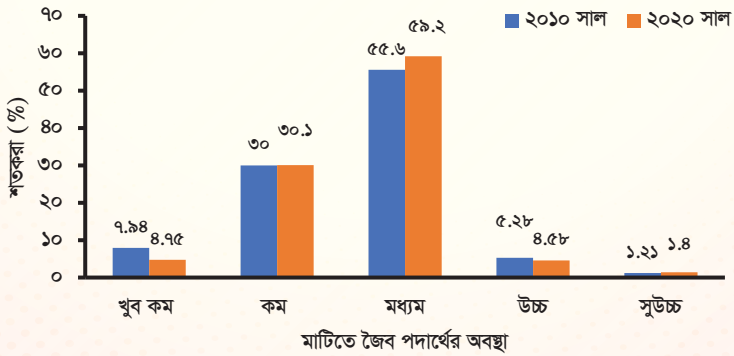

চিত্র. ১. বিগত ২০১০ থেকে ২০২০ সাল অবধি দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিবর্তন। *সূত্রঃ এসআরডিআই, ২০২০*

প্রায় ৫৫.৫৭, ৫.২৮ এবং ১.২১ শতাংশ আবাদযোগ্য জমিতে যথাক্রমে মাঝারি, উচ্চ এবং খুব উচ্চ স্তরের জৈব পদার্থ ছিল। ২০২০ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ি দেখা যায় আবাদযোগ্য জমির ৪.৭৫ শতাংশে খুব কম এবং ৩০.১ শতাংশে কম পরিমানে জৈব পদার্থ রয়েছে। প্রায় ৫৯.২, ৪.৫৮ এবং ১.৪০ শতাংশ আবাদি জমিতে যথাক্রমে মাঝারি, উচ্চ এবং খুব উচ্চ জৈব পদার্থ রয়েছে। যেখানে ২০১০ সালে ৩৭.৯ শতাংশ আবাদযোগ্য জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব কম থেকে কম, যা ২০২০ সালে কমে ৩৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১০ সালে আবাদযোগ্য জমির ৫৫.৬ শতাংশ মাঝারি মানের জৈব পদার্থের উপস্থিতি ছিল যা বর্তমানে বেড়ে ৫৯.২ শতাংশ হয়েছে। খুব কম থেকে কম জৈব পদার্থের জমির পরিমাণ হ্রাস এবং মাঝারি জৈব পদার্থের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ যথাক্রমে ২০১০ এবং ২০২০ সালে মাটির জৈব পদার্থের অবস্থা দেখানো হয়েছে এবং জৈব পদার্থের ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তথ্যের পরিবর্তন চিত্র দেখানো হয়েছে। সারণি ১ অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির জৈব পদার্থের অবস্থার (আয়তন এবং আবাদযোগ্য জমির শতাংশ) পরিবর্তন দেখানো হল।

সারণি ১: বিগত ২০১০ থেকে ২০২০ সাল অবধি দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন (আয়তন)

উর্বরতা শ্রেণী	২০১০ সাল	২০২০ সাল
	এলাকা (হেক্টর)	
খুব কম থেকে কম	৩৬৪১৯৬৬	২৯৯০৩৫৪
মধ্যম	৫৩৩৩৫৫৮	৫০৮২৩৯৬
উচ্চ	৫০৬৮৮২	৩৯৩৫১২
সুউচ্চ	১১৫৯৭৫	১২০৬০১
মোট	৯৫৯৮৩৮১	৮৫৮৬৮৬৩

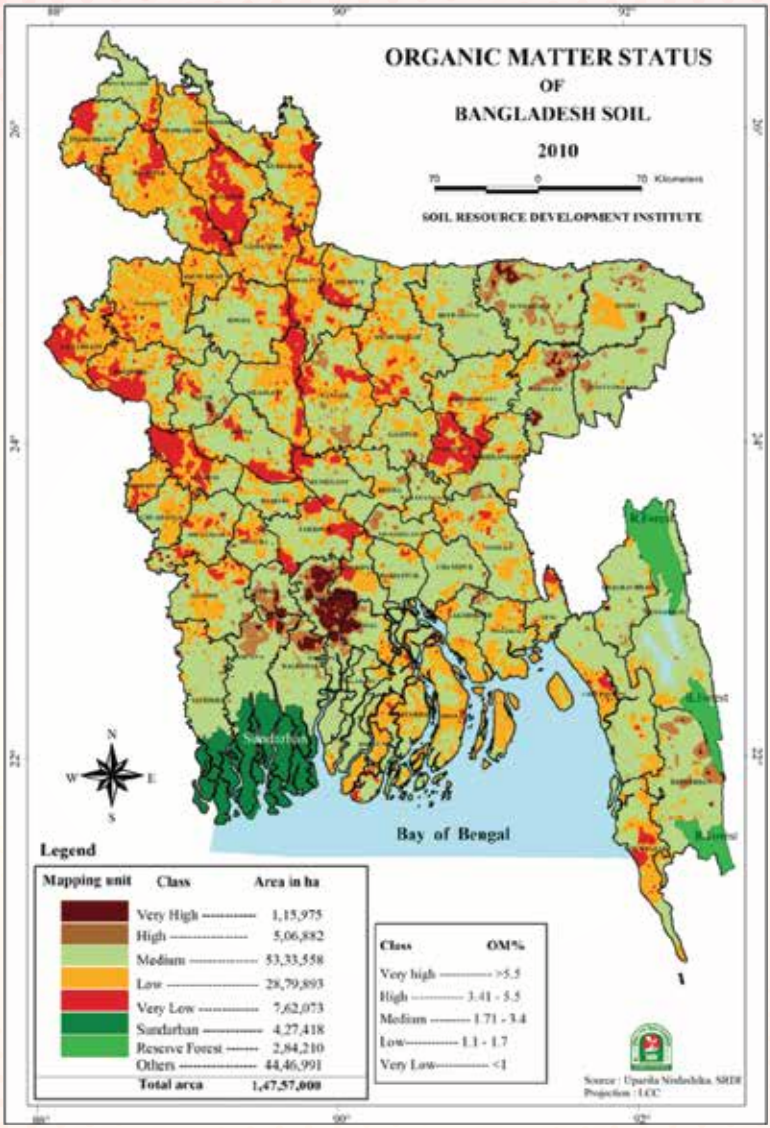

চিত্রঃ ২. ২০১০ সালে মাটির জৈব পদার্থের অবস্থা। *সূত্রঃ এসআরডিআই, ২০১০*

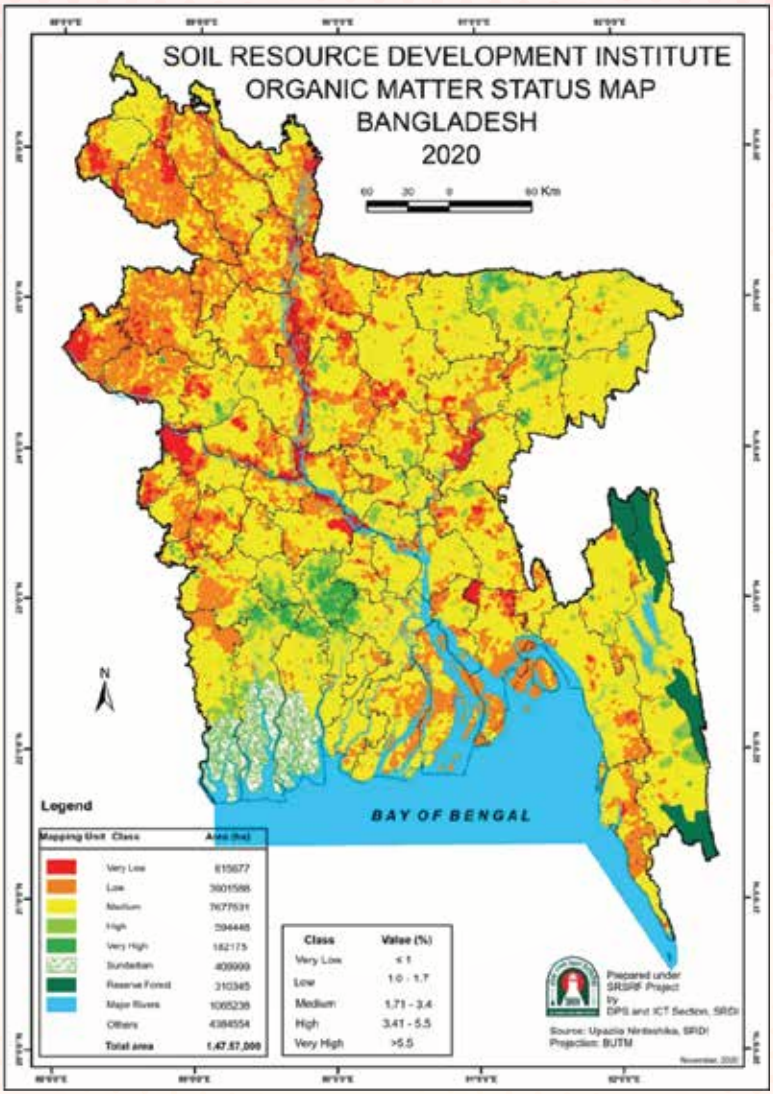

চিত্রঃ৩. ২০২০ সালে মাটির জৈব পদার্থের অবস্থা। *সূত্রঃ এসআরডিআই, ২০২০*

মাটির শ্রেণি ও প্রকার এবং মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্টের উপর মাটির গুনাগুন নির্ভর করে। একটি ভূমিতে কি পরিমান SOC পরিবর্তন হবে সে বিষয়টি ভূমি-ব্যবহারের ফসলের ধরন, ফসলের জাত, ফসলের অবশিষ্টাংশের ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। SOC হ্রাস পেতে পারে মূলত অটেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে (যেমন- নিবিড় চাষ, সম্পূর্ণ ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণ বা শস্যের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো, অপর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান এবং অল্প বা কোনো প্রকার সার প্রয়োগ না করা)। মাঠ গবেষণায় দেখা গেছে প্রচলিত চাষের তুলনায় শুন্য চাষে ফসলের চাষাবাদ মাটির জৈব পদার্থ (৫৮ শতাংশ SOC ধারণ করে) এবং মাটির সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বাড়ায়।

বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থ হ্রাসের কারণসমূহ

মাটিতে জৈব পদার্থের উপস্থিতি কৃষি-জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম এবং সময় বাড়ার সাথে সাথে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায় । তথ্যমতে ১৯৬৭-১৯৯৫ সালে সবচেয়ে বেশি জৈব পদার্থের অবক্ষয় ঘটেছে যা মেঘনা নদীর প্লাবনভূমির মাটিতে ৩৫ শতাংশ, মধুপুর অঞ্চলে ২৯ শতাংশ এভাবে ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমিতে ২১ শতাংশ, পুরাতন হিমালয় পিডমন্ট সমভূমিতে ১৮ শতাংশ এবং গাঙ্গেয় প্লাবনভূমিতে ১৫ শতাংশ । বাংলাদেশের ১৭টি সাধারণ মাটির ধরণ থেকে ১৭টি মৃত্তিকা সিরিজের জৈব পদার্থের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পীট মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ সর্বাধিক (৩৫.৩৭ শতাংশ), এসিড বেসিন ক্লে মাটিতে ৫.২ শতাংশ এবং এসিড সালফেট মাটিতে ৩.৪৬ শতাংশ, কিন্তু এই ধরণের মাটি কৃষি কাজের জন্য উপযোগী নয় কারণ এসব মাটিতে ফসল উৎপাদনে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অবশিষ্ট ১৪টি মৃত্তিকা সিরিজের মধ্যে শুধুমাত্র ৭টি মৃত্তিকা সিরিজে ২ শতাংশ এর বেশী জৈব পদার্থ ছিল এবং অন্য ১০টি মৃত্তিকা সিরিজে ২ শতাংশ এর নীচে ছিল। অবক্ষয় প্রাপ্ত মাটিতে অণুজীবের উপস্থিতি হ্রাস বা প্রাকৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক কারণ গুলির পরিবর্তনের ফলে মাটির জৈব পদার্থের হ্রাস ঘটে। জ্বালানীর স্বল্পতার কারণে গাছের অবশিষ্টাংশ যেমন: কাণ্ড,পাতা এমনকি শিকড় এবং গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মাটি থেকে জৈব পদার্থ কমে যাওয়ার কারণ গুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. মাটিতে জৈব পদার্থ পঁচনের উচ্চহার: বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থ পঁচনের হার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা মাটির অম্লত্ব মান ইত্যাদি কারণে প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের কৃষি জমির জন্য বাৎসরিক জৈব পদার্থের চাহিদা সঠিক মাত্রায় নেই। বাংলাদেশ একটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল যেখানে বছরে ৭-৮ মাস তাপমাত্রা বেশী থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা জৈব পদার্থের পঁচনের জন্য উপযুক্ত। মাটির অম্লত্ব মানের উপর মৃত্তিকা অণুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে জৈব পদার্থের দ্রুত পঁচন ঘটতে পারে।

২. প্রাকৃতিক গাছপালা এবং ফসলের অবিশিষ্টাংশ পোড়ানো: সাধারণত আমাদের দেশের কৃষকগন বিভিন্ন ফসলের অবশিষ্টাংশ যেমন ভূট্টা, ধান এবং অন্যান্য ফসলের অবিশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলে। এই কার্যকলাপটি মৃত্তিকা অণুজীবের সংখ্যা বিনষ্ট করে। ফলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যায়।

৩. অতিমাত্রায় চরাণো: সারাদেশে প্রকৃত চারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী জমি চারণ করার প্রবণতা রয়েছে। অত্যধিক চরাণোর কারনে উদ্ভিদের দরকারী প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হয় এবং উদ্ভিদের আবরনের ঘনত্ব হ্রাস করে। ফলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৪. ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণ: বাংলাদেশের অনেক কৃষক পশুখাদ্যের পাশাপাশি কম্পোস্ট তৈরীর জন্য বেডিং হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কৃষি জমি থেকে ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করে। আবার কখনও কখনও কৃষকরা জ্বালানির জন্য ক্ষেত থেকে ফসলের অবশিষ্টাংশগুলি সরিয়ে ফেলে যার ফলে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ হতে পারে না।

৫. চাষ: বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা কমিয়ে দেয় এমন একটি প্রধান অনুশীলন হলো চাষ। চাষের ফলে মাটিতে জৈব পদার্থের পঁচনের হার বেড়ে যায়।

৬. নিষ্কাশন: পর্যাপ্ত নিষ্কাশনের অভাবে বাংলাদেশের জলাবদ্ধ জমিতে যেখানে অল্প বায়ুযুক্ত অথবা বায়ুহীন পরিবেশ সেসব জায়গায় জৈব পদার্থের পঁচন ধীরে ধীরে ঘটতে পারে। একইভাবে, জৈব পদার্থ আর্দ্র মাটির পরিবেশে যেমন নিম্নচাপের মাটিতে (সিলেট, গোপালগঞ্জ ও খুলনাবিল) জমা হতে পারে।

৭. ভূমিক্ষয়: নদী ভাঙ্গন বাংলাদেশের একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দূর্যোগ। গবেষকরা অনুমান করেন যে, ভূমিক্ষয় সরাসরি আমাদের দেশের মোট প্লাবনভূমির প্রায় ৫% প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক দূর্যোগে মানুষের অনেক কৃষি জমি হারিয়ে গেছে।

৮. সার ও কীটনাশক ব্যবহার: কার্যকর ফল পেতে বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের জমিতে অজৈব সার ব্যবহার করতে চায়। অজৈব সার ব্যবহার অধিক ফসল ফলানোর জন্য সহায়ক কিন্তু কিছু কিছু সার ও কীটনাশক ব্যবহার বিশেষ করে নাইট্রোজেন সার মাটির অনুজৈবিক কার্যকলাপকে ব্যহত করে এবং মাটিতে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন যৌগ তৈরী করতে পারে।

৯. কম্পোস্ট ও সবুজ সারের কম ব্যবহার: বাংলাদেশে কম্পোস্ট ও সবুজ সারের ব্যবহার খুবই কম। বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের অবস্থা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে এমন জৈব সার ব্যবহারে কৃষকরা মনোযোগী নয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও মৃত্তিকা উর্বরতা

ভূমি ব্যবহারের ধরণ ও কৃষি উৎপাদনের উপযোগিতা, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, ভূমিশ্রেণি (উচু, নিচু, মাঝারি) অর্থাৎ প্লাবনের গভীরতা ও স্থায়িত্বকাল, কৃষি জলবায়ুর ভিন্নতা অনুযায়ী বাংলাদেশকে মোট ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। সমগ্র কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের ভূমির শ্রেণিবিন্যাস ও মৃত্তিকা উর্বরতার অবস্থা সারণি ২ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি ২. বন্যার গভীরতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ভূমির শ্রেণিবিন্যাস

ভূমির প্রকার	বন্যার গভীরতা	শতকরা
উঁচুভূমি	সাধারণ বন্যায় ভূমি পানিতে তলিয়ে যায় না	১৮
মাঝারি উঁচু ভূমি	বন্যার মৌসুমে সাধারণ বন্যায় যে সকল ভূমি সর্বোচ্চ ৯০ সেমি পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায়	৩২
মাঝারি নীচু ভূমি	বন্যার মৌসুমে সাধারণ বন্যায় যে সকল ভূমি সর্বোচ্চ ৯০ থেকে ১৮০ সেমি পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায়	১২
নীচু ভুমি	বন্যার মৌসুমে সাধারণ বন্যায় যে সকল ভূমি সর্বোচ্চ ১৮০ থেকে ৩০০ সেমি পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায়	৬
খুবই নীচু ভুমি	বন্যার মৌসুমে সাধারণ বন্যায় যে সকল ভূমি ৩০০ সেমি এর বেশি গভীরতা পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায়	২

সূত্রঃ (এফএও-ইউএনডিপি ১৯৮৮, এসআরডিআই-২০১০)

ভূমি শ্রেণি অর্থাৎ উঁচু, মাঝারি উচু, নীচু, অতি নীচু জমির কারণেও জমির উর্বরতার পার্থক্য হয়ে থাকে। এছাড়া মাটির গঠন ও প্রকৃতি, মাটির প্রকার, মাটির পিএইচ তথা অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব, জৈব পদার্থ, অনুজৈবিক কার্যাবলী, ফসল ও সার ব্যবস্থাপনা এবং পানির ব্যবস্থাপনা ও মাটির উর্বরতা তারতম্যের অন্যতম কারণ। আবার সৃষ্টিগতভাবেই কোন কোন মাটি বেশি উর্বর আবার কোন কোন মাটি কম উর্বর। সাধারণত উঁচু জমি কম উর্বর এবং নীচু জমি বেশি উর্বর হয়ে থাকে। মাটির প্রকার অর্থাৎ বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল মাটির মধ্যেও উর্বরতার পার্থক্য রয়েছে। বেলে মাটির চেয়ে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি বেশি উর্বর। মাটির পিএইচ তথা অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব দ্বারা মাটির উর্বরতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। অধিক অম্লত্ব বা অধিক ক্ষারকত্ব বিশিষ্ট মাটি কৃষি কাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। ফসলের অত্যাবশ্যকীয় সকল পুষ্টি উপাদান (যেমনঃ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার, জিংক, বোরন ইত্যাদি) উপযুক্ত পরিমাণে

বিদ্যমান থাকলে তাকে উর্বর মাটি বলে থাকি। কোন কোন মাটিতে ফসলের খাদ্য উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা ফসলের গ্রহণোপোযগী আকারে থাকে না এবং ফসল তা গ্রহণ করতে পারে না। মৃদু অম্লত্ব থেকে নিরপেক্ষ মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

সারণি ৩ এ দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মাটিতে নাইট্রোজেন সহ সকল পুষ্টি উপাদান হ্রাস পেয়েছে। তবে কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল ১৪. গোপালগঞ্জ-খুলনা অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমান নাইট্রোজেন আছে। উঁচু জমির তুলনায় নীচু জমিতে ফসফরাসের পরিমান আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল ১৩, ২৩, ২৪ অঞ্চলের মাটিতে ফসফরাসের পরিমাণ খুবই কম। ২০১০ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ১২ শতাংশ জমিতে ফসফরাসের ঘাটতি বেড়েছে এবং উচ্চ মাত্রার ফসফরাস সমৃদ্ধ ভূমি হ্রাস পেয়েছে ৩ শতাংশ (সারণি ৪)। বিগত ১০ বছরে প্রায় ১৫ শতাংশ উচ্চ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ আবাদি জমি হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে ১২.৫৪ শতাংশ হয়েছে। এছাড়াও আবাদি জমিতে সালফারের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। বিগত ১০ বছরে ১৮ শতাংশ উচ্চ মাত্রার সালফার সমৃদ্ধ ভূমি হ্রাস পেয়েছে এবং পশাপাশি ১২ শতাংশ আবাদি জমিতে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে জিংকের ঘাটতি চোখে পড়ার মত। আবাদি জমিতে যেখানে ২৮.৭ শতাংশ জমিতে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি ছিল তা বর্তমানে বেড়ে দাড়িয়েছে ৭৮.৮ শতাংশ এবং যেখানে ৩৭.৬ শতাংশ আবাদি জমিতে তুলনামুলক বেশি পরিমাণে জিংক ছিল যা বর্তমানে কমে ৪.৯৭ শতাংশ দাড়িয়েছে । বোরনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ আবাদি জমিতে বোরনের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে যেখানে ৩৭.০ শতাংশ আবাদি জমিতে উচ্চ মাত্রার বোরন ছিল তা ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দোআঁশ থেকে এঁটেল মাটিতে উচ্চ ভূমির ফসল এবং জলাভূমির ধানের ফসল উভয় স্থানে বছরের পর বছর ধরে চাষাবাদের ফলে মাটির সালফার ও বোরনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটি ফসলের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং অপর্যাপ্ত সালফার ও বোরন সার প্রয়োগের কারণে হতে পারে।

সারণি ৩ : ভূমির শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জমির উর্বরতার বিবরণী

ভূমির প্রকার	মৃত্তিকা অম্লত্ব (p^H)	জৈব পদার্থ (%)	উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান								
			নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (ppm)	পটাশিয়াম (meq/100g)	সালফার (ppm)	ক্যালসিয়াম (meq/100g)	ম্যাগনেশিয়াম (meq/100g)	জিংক (ppm)	বোরন (ppm)	মোলিবডেনাম (ppm)
উঁচু জমি	৪.০-৮.২	≤ ১-৩.৪	০.০৯-০.১৮	*≤ ৭.৫-২২.৫ **≤ ৫.২৫-১৫.৭৫	≤ ০.০৯-০.২৭	৭.৫১-৩০	১.৫১-৬.০০	০.৩৭৬-১.৮৭৫	০.৪৫১-১.৩৫	০.১৬-০.৪৫	০.০৭৬-০.৩০
মাঝারি উঁচুভুমি	৪.০-৮.৪	≤ ১ - ৩.৪	≤০.০৯-০.৪৫	*≤ ৭.৫-২২.৫ **≤ ৫.২৫-১৫.৭৫	≤ ০.০৯-০.৪৫	৭.৫১-৩৭.৫	১.৫১-৭.৫	০.৩৭৬-১.৮৭৫	০.৪৫১-১.৮	০.১৫১-০.৬০	০.০৭৬-০.৩০
মাঝারি নিচুভুমি	৪.৫-৮.১	১-৫.৫	≤০.০৯-০.১৮	*≤ ৭.৫-২২.৫ **≤ ৫.২৫-১৫.৭৫	০.০৯১-০.৩৬	৭.৫১-৩৭.৫	১.৫১-৭.৫	০.৩৭৬-১.৮৭৫	০.৪৫১-১.৩৫	০.১৫১-০.৬০	০.০৭৬-০.৩০
নীচুভুমি	৪.১-৭.৭	≤ ১-৫.৫	≤০.০৯-০.৪৫	*৭.৫১-২২.৫ **৫.২৬-১৫.৭৫	০.০৯১-০.৩৬	৭.৫১-৩০.০	১.৫১-৭.৫	০.৩৭৬-১.৮৭৫	০.৪৫১-১.৮	০.১৫১-০.৬০	০.০৭৬-০.৩০
খুবই নীচু ভুমি	৪.৩-৬.৭	১.৭১-৫.৫	০.০৯১-০.৪৫	*৭.৫১-২২.৫ **৫.২৬-১৫.৭৫	০.০৯১-০.৩৬	১৫.১-৩৭.৫	৩.১-৬.০	০.৭৫১-১.৫	০.৪৫১-১.৮	০.১৫১-০.৬০	০.২২৬-০.৩০

*NB: * Olsen method and ** Bray & Kurtz method, Source: Soil fertility Trends in Bangladesh, SRDI 2020*

সারণি ৪ : ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট আবাদি জমিতে (লক্ষ হেঃ) উর্বরতা পরিবর্তনের বিবরণী

উর্বরতার	ফসফরাস		পটাশিয়াম		সালফার		জিংক		বোরন	
শ্রেণী	২০১০	২০২০	২০১০	২০২০	২০১০	২০২০	২০১০	২০২০	২০১০	২০২০
খুব কম থেকে কম	৩৭.০৫	৪৩.১৬	২৭.২০	৩৭.১২	৩০.০৬	২৭.৫৫	২৭.৫৬	৬৭.৭০	২৪.৯৪	২৬.৪৩
মধ্যম	২০.৩০	১৮.৪০	২১.২২	২৬.৫০	১৭.৯০	১৮.২৩	১৮.২৩	৯.৯১	২০.০৬	২৩.৫০
পর্যাপ্ত	১০.৯৮	১০.৬৩	১৯.৪৫	১১.৪৭	১০.৯৩	১৪.০৮	১৪.০৮	৩.৯৯	১৫.৪২	১৩.৬৫
বেশি থেকে খুব বেশি	২৭.৬৭	১৩.৬৭	২৮.১১	১০.৭৭	৩৪.০৮	৩৬.১২	৩৬.১২	৪.২৭	৩৫.৫৫	২২.২৮

Source: Soil fertility Trends in Bangladesh, SRDI 2020

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের উপায়

বীজের পর মাটি হচ্ছে কৃষির অন্যতম ভিত্তি। উপযুক্ত মাটি না হলে অর্থাৎ ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ মাটি না হলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় আবাদি জমির পরিমাণ খুবই কম। তাই এ জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক ফসল আবাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক তা হলো-

১. ভূমি ক্ষয়রোধ

মাটির উপরিভাগে সাধারণত ৭"-৮" ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ত ফসলের পুষ্টি উপাদান থাকে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহ, বাতাসের গতি ইত্যাদির কারণে উপরিভাগের মাটি স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সঞ্চিত পুষ্টি উপাদান বিনষ্ট হয়ে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। তাই বৃষ্টিও বন্যার পানি গড়ানের সময় যাতে জমির উপরিভাগের মাটি অপসারিত না হয় এবং নালা ও খাদের সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ

উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় বিভিন্ন ফসল আবাদের ফলে মাটির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। বিভিন্ন ফসল মাটি থেকে বিভিন্ন পরিমাণে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। তাই ঘাটতি পূরণের জন্য জমিতে জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বয়ে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা উচিত।

৩. জৈব পদার্থ ব্যবহার

মাটির ভৌতিক ও রাসায়নিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য জৈব পদার্থের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান সরবরাহ, মাটির অম্লত্ব ক্ষারকত্বের তারতম্য রক্ষা এবং মাটির রাসায়নিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। তাই জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ গোবর সার, কম্পোস্ট, খামারজাতসার ইত্যাদি প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। সবুজসার ও বিভিন্ন ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে মিশিয়ে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আদর্শ মাটিতে কমপক্ষে ৫% জৈব পদার্থ থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং জমিতে পর্যাপ্ত পরিমানে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

৪. উপযুক্ত শস্য বিন্যাস অনুসরণ

জমিতে প্রতি বছর একই ফসল বা একই ধরনের ফসলের চাষ করলে একটি নির্দিষ্ট স্তরের নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান ক্ষয় হয়ে উর্বরতা বিনষ্ট হয়। তাই পর্যায়ক্রমে গুচ্ছমূল

জাতীয় ফসলের পর প্রধান মূলজাতীয় ফসল, একবীজপত্রীর পর দ্বিবীজপত্রীর ফসল এবং অধিক খাদ্য গ্রহণকারীর পর স্বল্পখাদ্য গ্রহণকারী ফসল আবাদ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মাটির প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে উপযুক্ত শস্য বিন্যাস অনুসরণ করতে হবে।

৫. ডাল জাতীয় ও সবুজসার ফসলের চাষ

বিভিন্ন ধরনের ফসল মাটি থেকে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। ফলে মাটি দ্রুত এর অভাব দেখা দেয়। জমিতে মাঝে মধ্যে ডাল জাতীয় ফসল চাষ করে এ ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা যায়। কারণ এগুলো শিকড়ের শুঁটিতে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটোরিয়া বসবাস করে এবং বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আহরণ পূর্বক গুটিতে সঞ্চয় করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। ধৈঞ্চা ও শিমজাতীয় শস্য চাষ করে সবুজ অবস্থায় মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। বছরে অন্তত একবার সবুজসার তৈরি করা উচিত।

৬. আচ্ছাদন শস্যের চাষ

কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান রোদের তাপে নষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে জমি লতাপাতায় ঢেকে থাকে এমন শস্য (যেমন-শসা, বাংগি, তরমুজ, আলু, মিষ্টিকুমড়া, ক্ষিরা ইত্যাদি) চাষ করলে ঐসব পুষ্টি উপাদন মাটিতে সংরক্ষিত থাকে।

৭. জাবরা প্রয়োগ

কিছু কিছু ফসলে (আলু) জাবরা প্রয়োগ করতে হয়। এতে জাবরা দ্বারা মাটি ঢাকা থাকে ফলে পুষ্টির অপচয় হয় না।

৮. দেশী জাতের শস্যের চাষ

হাইব্রিড বা উচ্চফলনশীল জাতের শস্য মাটি থেকে প্রচুর পুষ্টি উপাদান শোষণ করে মাটিকে অনুর্বর করে। অপর দিকে দেশী জাতের শস্য কম পুষ্টি শোষণ করে।

৯. শস্যের অবশিষ্টাংশ জমিতে রাখা

জমি থেকে শুধু ফসল সংগ্রহ করার পর খড় বা শাখা-প্রশাখা-লতাপাতা জমিতে রাখলে পরবর্তীতে শস্যচাষ করার সময় মাটিতে মিশালে মাটি উর্বর হয়।

১০. জীবাণু সারের ব্যবহার

ইউরিয়া সারের পরিবর্তে জীবাণু সার ব্যবহার করলে রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে মাটিকে উর্বর করে।

১১. জমিকে বিশ্রাম দেয়া

দীর্ঘদিন ধরে একই জমিতে কোনোরূপ বিশ্রাম ছাড়া নিবিড় চাষাবাদ করা হলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির অবনতি ঘটে। তাই কয়েক বছর পর অন্তত এক মৌসুমের জন্য জমি পতিত রেখে বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন। অবশ্য এ সময়ে জমিতে সবুজ সারের চাষ বা নিয়মিত পশুচারণের ব্যবস্থা করলে ভূমির উর্বরতা আরোও বৃদ্ধি পায়।

১২. মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব নিয়ন্ত্রণ

মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব অতিরিক্ত বেড়ে গেলে উর্বরতা হ্রাস পায় এবং ঐ অবস্থায় অনেক খাদ্যোপাদানে ফসলের গ্রহণ উপযোগী হয় না। তাই প্রয়োজনে জৈব সার প্রয়োগে অম্লত্ব ক্ষারকত্ব কমাতে হবে।

১৩. চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়ন

ত্রুটিপূর্ণ চাষাবাদ পদ্ধতি মাটির উর্বরতা বিনষ্ট করে। কিন্তু উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা সম্ভব। জমি সবসময় একই গভীরতায় কর্ষণ করলে ঐ গভীরতার নিচে একটা শক্তস্তরের সৃষ্টি হয় এবং ওই স্তরের নিচ থেকে খাদ্যোপাদান আহরণ করতে পারে না। তাই ভূমিকর্ষণের গভীরতা ও অন্যান্য আবাদ প্রক্রিয়া মাঝেমাঝে পরিবর্তন করা উর্বরতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক।

১৪. সুষ্ঠু পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা

সুষ্ঠু সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে মাঠের উর্বরতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই জমিতে পরিমিত সেচ দেয়া ও অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

১৫. ক্ষতিকারক রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

মাটিতে অনেক সময় ক্ষতিকর রোগ ও কীটের জীবাণু বা ডিম থাকে এবং ফসল উৎপাদন কালে সেগুলো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পর্যায়ক্রমে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে জমি চাষ করলে এবং মাটি রোদে শুকিয়ে নিলে সেগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় এবং মাটির উন্নয়ন সাধিত হয়। প্রয়োজনে সঠিক সময়ে সঠিক কৌশলে উপযুক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে।

১৬. আগাছা দমন

আগাছা মাটি থেকে খাবার গ্রহণ পূর্বক ভূমির উর্বরতা খর্ব করে ও শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই জমিতে কখনও আগাছা জন্মাতে না দেয়া ও সর্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

১৭. মৃত্তিকা জীবাণু সংরক্ষণ

মাটিতে অসংখ্য উপকারী জীবাণু থাকে এবং এরা ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি অদ্রবণীয় পদার্থসমূহকে পানিতে দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তর ও বায়ু থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন সংযুক্ত করে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তাই মাটিকে এমন ভাবে পরিচর্যা করা দরকার যেন মৃত্তিকা জীবাণু সমূহের বসবাসের পরিবেশ সমুন্নত থাকে।

১৮. পক মাটি ব্যবহার

সাধারণত বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানির সাথে মাটির উপরিভাগের পুষ্টিউপাদান ও জৈব পদার্থ অপসারিত হয়ে পথিমধ্যে পুকুর, ডোবা, নালা প্রভৃতির তলদেশে জমা হয়। এ ভাবে জমাকৃত মাটিকে পক মাটি বলে এবং এটা খুবই উর্বর হয়। শুষ্ক মৌসুমে ঐ মাটি কেটে আবাদি জমিতে মিশিয়ে দিলে মাটির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

মাটির উর্বরতা শক্তি ও জৈব পদার্থের উপস্থিতি বিষয়ক গবেষণা

মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ৫ শতাংশ হলে সে মাটিকে সবচেয়ে ভালো বলা হয়। ন্যূনতম ২ শতাংশ থাকলে সেটিকে ধরা হয় মোটামুটি মানের। কিন্তু দেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ এখন গড়ে ২ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। এছাড়া জৈব পদার্থের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে, যা দেশের মোট জমির প্রায় ৭৯ শতাংশ। মাটির উর্বরতা শক্তি ও জৈব পদার্থের উপস্থিতি নিয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) একটি গবেষণা চালিয়েছে। 'ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ সমীক্ষায় মাটির উর্বরতা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি ও নানা পুষ্টিকণা কমে যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। পাশাপাশি ভূমিক্ষয়, অম্লমাটির পরিমাণ, উপকূলের লবণাক্ত এলাকা ও খরাপ্রবণ এলাকায় কী পরিমাণ পুষ্টি ঘাটতি মাটি রয়েছে তারও পূর্ণাঙ্গ তথ্য উঠে এসেছে যা সারণি-৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫. বাংলাদেশে মৃত্তিকা অবক্ষয়ের চিত্র

অবক্ষয়ের ধরন	এলাকার পরিমাণ (লাখ হেক্টর)	শতকরা হার (%)
ফসফরাস ঘাটতি	৬৬.০	৪৪.৭
পটাশিয়াম ঘাটতি	৫২.৭	৩৫.৭
সালফার ঘাটতি	৬৫.৩	৪৪.২
জিংক ঘাটতি	৫৫.৫	৩৭.৬
বোরন ঘাটতি	৫১.১	৩৪.৬

অবক্ষয়ের ধরন	এলাকার পরিমাণ (লাখ হেক্টর)	শতকরা হার (%)
জৈব পদার্থ ঘাটতি	১১৬.৪	৭৮.৯
অম্লীয় মৃত্তিকা	৮৩.৭	৫৬.৭
পাহাড়ে ভূমিক্ষয়প্রাপ্ত	১৭.০	১১.৫
উপকূলে লবণাক্ত	১০.২	৬.৯
খরাপ্রবণ	১৪.৩	৯.৭

সূত্র: এসআরডিআই, ২০২০

দেশে সব ধরনের বিশেষ করে আবাদি, বনভূমি, নদী, লেক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সুন্দরবন ইত্যাদি এলাকা মিলিয়ে জমির পরিমাণ ১ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে ফসফরাস ঘাটতিযুক্ত এলাকার পরিমাণ ৬৬ লাখ হেক্টর, যা মোট জমির প্রায় ৪৫ শতাংশ। অন্যদিকে পটাশিয়ামের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৫২ লাখ ৭০ হাজার বা ৩৫.৭ শতাংশে। সালফারের ঘাটতি রয়েছে ৬৫ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর বা ৪৪.২ শতাংশ এলাকায়। এর বাইরে বোরনের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৫১ লাখ ১০ হাজার হেক্টরে (মোট জমির ৩৪.৬শতাংশ)। জৈব পদার্থের ঘাটতি রয়েছে ১ কোটি ১৬ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর বা মোট জমির প্রায় ৭৮.৯০ শতাংশে।

এসআরডিআই এর তথ্যমতে, পদ্মা অববাহিকা ও হাওড়াঞ্চলের কৃষি জমিতে স্বাভাবিকের তুলনায় জিংকের পরিমাণ কম। এর মধ্যে পদ্মা নদীর অববাহিকার মাটিগুলোয় চুন ও ক্ষারের (পিএইচ) মাত্রা অনেক বেশি। অন্যদিকে হাওড়াঞ্চলের জেলাগুলোয় আবাদি এলাকা নিচু হওয়ার কারণে কৃষি জমিগুলো অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকে। এজন্য সেখানে দেখা দেয় জিংকের অভাব। সব মিলিয়ে দেশে এখন জিংকের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৫৫ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে, যা মোট জমির প্রায় ৩৮ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রমাগত ফসল ফলানোর কারণে দেশের মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে জৈব পদার্থ নেই। মাটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। অপরিকল্পিত চাষাবাদ, মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন, দূষণ, ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস এবং অপরিকল্পিতভাবে সারের ব্যবহারের কারণে মাটির উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ইটভাটার জন্য মাটির উপরিভাগের অংশ তুলে নেয়া ছাড়াও মাটির টেকসই ব্যবস্থাপনার অভাবে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতির ফলে মৃত্তিকা এখন হুমকির মুখে রয়েছে। এসব কারণে মাটির স্বাস্থ্যহীনতায় এখন প্রতি বছর ফসল উৎপাদনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

দেশের ১ কোটি ১৬ লাখ হেক্টরের বেশি জমিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি রয়েছে। তার মধ্যে খুব বেশি ঘাটতি রয়েছে (ভেরি সিভিয়ার) দেশের ১১ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর জমি। ঘাটতি (সিভিয়ার) অবস্থায় আছে ২৮ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর, মোটামুটি ঘাটতি (মডারেট) অবস্থায় আছে ৩৫ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর ও স্বল্প ঘাটতি (লাইট) অবস্থায় আছে ৩৩ লাখ ৯০ হাজার হেক্টর জমি। অন্যদিকে দেশে অম্লযুক্ত মৃত্তিকার উপস্থিতি রয়েছে প্রায় ৮৩ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর বা মোট জমির প্রায় ৫৬.৭ শতাংশে। পাহাড়ে ভূমিক্ষয় প্রাপ্ত এলাকা রয়েছে ১৭ লাখ হেক্টর। উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ ২০ হাজার হেক্টর। খরাপ্রবণ এলাকার পরিমাণ প্রায় ১৪.৩০ লাখ হেক্টর।

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই প্রধান প্রধান ফসলের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সার ব্যবহার করেন। প্রশিক্ষণ ও জানাশোনার অভাবে সুষম সার ব্যবহার করেন খুব কমসংখ্যক কৃষক। অপরিমিত ও মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহারে ফলনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং জমিতে ব্যবহৃত সারের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময়ে জমিগুলো অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়বে এবং কৃষিতে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে। এজন্য রাসায়নিক ও জৈব সারের মিশ্র প্রয়োগের মাধ্যমে জমি থেকে ফসলের আহরিত খনিজ ও জৈব পদার্থের মাত্রা যদি সঠিকভাবে ধরে রাখা যায় তাহলে মাটির উর্বরতা শক্তি ধরে রাখা সম্ভব। ঘাটতি কমানোর পাশাপাশি উর্বরতা শক্তি ধরে রাখতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি জমি চাষে রোটেশন পদ্ধতি অনুসরণ ও কৃষি উপকরণ ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

জমির উর্বরতা শক্তি সংরক্ষণে অবহেলা খাদ্যনিরাপত্তায় বড় হুমকি হতে পারে। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থেই প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ জরুরি। মনে রাখতে হবে শুধু টেকসই কৃষি উৎপাদনই নয়, সমগ্র জীবমণ্ডলের অস্তিত্বও এখন মাটির স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। কৃষকের খাদ্য ও আর্থিক প্রয়োজনের কারণেই তাকে উপর্যুপরি ফসল ফলাতে হচ্ছে। সমভূমিতে হোক বা পার্বত্যাঞ্চল একই জমি বারবার একই পদ্ধতি ও একই ধরনের ফসল চাষ না করে আধুনিক নীতিকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষক সমাজ সচেতন না হলে কার্যকরভাবে নীতিকৌশল বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। এ বিষয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন দরকার।

মাটির জৈব পদার্থ ভাঙ্গনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার এবং অল্প পরিমাণে অনুপুষ্টি নির্গত হয়। জৈব অবশিষ্টাংশ প্রয়োগের ফলে মাটিতে খনিজ পুষ্টি ফিরে আসে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার-এর গ্রহণযোগ্য আকারগুলিতে রূপান্তর অণুজীবের কার্যকলাপের মাধ্যমে ঘটে এবং তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পিএইচ ইত্যাদি দ্বারা অণুজীবের কার্যকলাপকে প্রভাবিত হয়। জৈব পদার্থ থেকে ফসলের

পুষ্টির প্রাপ্যতা নির্ভর করে ভাঙ্গনের হার (Mineralization rate) এবং ব্যাপ্তির উপর। সমস্ত জৈবযৌগগুলি তাদের ধারক হিসাবে মাটি ব্যবহার করে বা তারা জৈব পদার্থের উপর বাস করে এবং পচে সাধারণ উপাদান তৈরী করে। এই পণ্যগুলি মাটির উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং পরিবেশগত নিয়ন্ত্রক কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী।

মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য ফসল এবং শস্যের ধরণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শীত ও বর্ষাকালের ফসলের মধ্যেবর্তী সময়ের ব্যবধানকে কাজে লাগানোর জন্য গ্রীষ্মকালে মুগডাল চাষ সবচেয়ে কার্যকরি। শুঁটি বাছাই করার পরে মুগডালের অবশিষ্টাংশগুলিকে অন্যান্য লিগিউম জাতীয় ফসলের অবশিষ্টাংশের সাথে মাটিতে মিশিয়ে দিলে সবুজ সার হিসাবে কার্যকরী ফল পাওয়া যায়। লিগিউম শুধুমাত্র ফলনই দেয় না বরং পরবর্তী বা সহচর ফসলের জন্যও উপকার করে। এক গবেষণায় দেখা যায় পঞ্চাশ দিন বয়সী সবুজ সার ফসলকে চাষের পর মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার পর রোপা আমন (পরবর্তী ফসল) এবং সরিষা (পরবর্তী ফসল) সারের সুপারিশকৃত মাত্রা এবং নাইট্রোজেন সারের হেক্টর প্রতি প্রস্তাবিত মাত্রার অর্ধেক প্রয়োগে যে ফলন পাওয়া যায় তা সারের সুপারিশকৃত মাত্রার সমান। এছাড়াও ১০০% অনুমোদিত সার প্রয়োগ থেকে যে ফলন পাওয়া যায় তার তুলনায় ৭৫% অনুমোদিত সার প্রয়োগ + লিগিউমের অবশিষ্টাংশ ব্যবহারে বেশি ফলন পাওয়া যায়। গম-ধান শস্য পর্যায় মুগডালের অন্তর্ভুক্তি গম-ধানের শস্য পর্যায় তুলনায় গড়ে ৫৭% বেশি গমের সমতুল্য ফলন দিয়েছে এছাড়াও ১০০% রাসায়নিক সার প্রয়োগের তুলনায় সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি পদ্ধতি (IPNS) ভিত্তিক সার এবং গোবর সার প্রযোগে ভাল ফলন ও উৎপাদন দক্ষতা বেশি। গবেষণায় দেখা যায় মধ্যম ফলন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অজৈব সারের সাথে ধৈঞ্চা বায়োমাস এবং মুগবিনের অবশিষ্টাংশ মাটিতে অন্তর্ভুক্তি ফলে উচ্চ ফলন লক্ষ্যমাত্রার সমান হয় এবং সারের অপচয় রোধ করা যায়। রোপা আমন ধানের আগে মুগডালের অবশিষ্টাংশ বা সেসবানিয়া বায়োমাস যোগ করা হলে তা উচ্চ ফসলের উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে পারে এবং মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে পারে। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে শস্য, পদ্ধতিতে শিমজাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে মাটির গঠন, ব্যাপ্তিযোগ্যতা (Permeability), উর্বরতা এবং বায়ু সঞ্চালন হার উন্নত হয়। ফসল কাটার সময় অপসারিত পুষ্টি উপাদানগুলি পুনরায় পূরণ করা না হলে এবং মাটির জৈব পদার্থের স্তর বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করা না হলে কৃষি উৎপাদন টিকিয়ে রাখা যায়না।

জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব সার পাওয়া যায় যেমন: গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, খামার জাত সার (গবাদি পশুর মলমূত্র, মুরগির বিষ্ঠা, খড়কুটা, সবজি ও ফসলের পরিত্যক্তাংশ ইত্যাদি থেকে তৈরী সার), সবুজ সার অন্যতম। এছাড়াও ফসল কর্তনের সময়

সবজি ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, খড়কুটা ইত্যাদি কিছুটা জমিতে রেখে দিলেও তা পঁচে মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বর্তমানে যে সকল জৈব সার,সবুজসার ও ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ব্যবহার করা হয় তাদের পুষ্টি উপাদানের শতকরা পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল (সারণি ৬)।

সারণি ৬: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বিভিন্ন জৈব সার, সবুজ সার ও ফসলের অবশিষ্টাংশে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের শতকরা পরিমাণ

জৈব সার	আর্দ্রতা (%)	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাসিয়াম (%)
গোবর	৭০±৭	০.৭±০.০৭	০.১৫±০.০১	০.৫±০.০৫
পঁচা গোবর	৩৫±৩.৫	১.২±০.১২	১.০±০.১	১.৬±০.১৬
খামারজাত সার	৬৭±৬.৭	১.৬±০.১৬	০.৮৩±০.০৮	১.৭±০.১৭
মুরগির বিষ্ঠা সার	৫৫±৫.৫	১.৯±০.১৯	০.৫৬±০.০৬	০.৭৫±০.০৭
কম্পোস্ট সার	৪০±৪.০	০.৭৫±০.০৭	০.৬±০.০৬	০.১±০.১
সরিষার খৈল	১৫±১.৫	৫.০±০.৫	১.৮±০.১৮	১.২±০.১২
বায়োস্লারী (গোবর)	২০±২.০	১.০১±০.০১	০.৫৯±০.০৬	০.২৮±০.০৩
বায়োস্লারী (মুরগীর বিষ্ঠা)	২০±২.০	১.৪৮±০.০১	০.৬৯±০.০৭	০.৩৬±০.০৪
কম্পোষ্ট (গ্রামাঞ্চল)	৪০±৪.০	০.৭৫±০.০৭	০.৬±০.০৬	১.০±০.১
কম্পোষ্ট (শহরাঞ্চল)	৪০±৪.০	১.৫±০.১৫	০.৬±০.০৬	১.৫±০.৫
কম্পোষ্ট (কচুরীপানা)	৭০±৭.০	১.৫±০.১৫	০.৮±০.০৮	০.৩±০.৩
সরিষার খৈল	১৫±১.৫	৫.৫±০.৫৫	১.৪±০.১৪	১.২±০.১২
তিসির খৈল	১৫±১.৫	৫.৫±০.৫৫	১.৪±০.১৪	১.২±০.১২
তিলের খৈল	১৫±১.৫	৬.২±০.৬২	২.০±০.২	১.২±০.১২
প্রেসমাড	৫৫±৫.৫	১.৮৫±০.১৮	০.১৩±০.০২	০.৫৪±০.০৫
ধৈঞ্চা	৮০±৮	০.৭±০.০৭	০.৪±০.০৪	০.৪±০.০৪
মুগ	৭০±৭	০.৮±০.০৮	০.২±০.০২	০.৫±০.০৫
ছোলা	৭০±৭	০.৮±০.০৮	০.২৮±০.০২	০.৫±০.০৫
ধানের খড়	৩০±৩	০.৪±০.০৪	০.১±০.০১	১.৫±০.১৫
গমের খড়	২০±২	০.৫±০.০৫	০.৩±০.০৩	০.৯±০.০৯
আখের খড়	২০±২	১.০±০.১	০.৫±০.০৫	১.৪±০.১৪

সূত্রঃ সার সুপারিশমালা হাতবই ২০১৮, বিএআরসি

মৃত্তিকার উর্বরতা ও ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে (সারণি ৭)

সারণি ৭: মৃত্তিকার উর্বরতা ও ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ

প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য
টমেটোর ফলন বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভার্মিকম্পোষ্টের ব্যবহার।	কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১-গাজীপুরে ১.৫ ট/হে. ভার্মিকম্পোষ্টের সাথে ১০০ ভাগ সুপারিশকৃত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে টমেটোর ফলন বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন করা যায়।
জৈব সার প্রয়োগে সবজি উৎপাদন এবং মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে মাটিতে কার্বন সংরক্ষন	সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগে সবজি ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায় এবং মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে মাটিতে কার্বন সংরক্ষণ করা যায় ফলে পরিবেশ ভাল থাকে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে ১০০ ভাগ রাসায়নিক সারের সাথে হেক্টর প্রতি ৩ টন ভার্মিকম্পোষ্ট প্রয়োগের মাধ্যমে কম খরচে অধিক ফলন এবং নিরাপদ খাদ্য পাওয়া সম্ভব। সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগে ব্রোকলির ফলন ২১.৯৮ টন/হে. পাওয়া যায়।
চীনাবাদাম উৎপাদনে অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোষ্ট ও রাসায়নিক সারের প্রভাব।	কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৩ (বরিশাল) এ চীনাবাদাম উৎপাদনে হেক্টর প্রতি ৫.০ টন ভার্মিকম্পোষ্ট এবং রাইজোবিয়াম অণুজীব সারের সাথে ইউরিয়া সার ব্যতীত সমন্বিত উদ্ভিদপুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূবাঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এতে কৃষক যেমন উপকৃত হবে তেমন মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হবে।
টমেটো-মুগডাল-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের ফলন বৃদ্ধিতে ভূমি কর্ষণ এবং জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের প্রভাব	মধ্যম গভীরতায় (১০-১২ সে.মি.) ভূমি কর্ষণ পূর্বক সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে জৈব ও অজৈব সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করলে টমেটো-মুগডাল-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের ফলন প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় (১৭-২৪%) ফলন বৃদ্ধি পায় । এছাড়া মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা (২.৬-৩.৫%) বৃদ্ধি পায়।

প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য
ফসল বিন্যাসের ফলন বৃদ্ধিতে ও মৃত্তিকার ভৌতগুণাবলী উন্নয়নে সংরক্ষিত কর্ষণ ও শস্যের অবশিষ্টাংশ ব্যবহারের প্রভাব	গম-ধৈঞ্চা-রোপা আমন এবং গম-মুগডাল-রোপা আমন শস্য বিন্যাস এ সংরক্ষিত কর্ষণ (১০-১২ সে.মি.গভীর) পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং উক্ত সীম জাতীয় শস্যের অবশেষ মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিলে ফসলের ফলন গম-পতিত-রোপা আমন বিন্যাস অপেক্ষা বৃদ্ধি পায় । উক্ত ফসল বিন্যাস একই জমিতে পর পর ৩-৪ বছর আবাদ করলে জমিতে জৈব কার্বণের পরিমান প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির চেয়ে ১০-১৫% বৃদ্ধি পায়। মাটির আয়তনী ঘনত্ব কমে যায়, পানি ধারণ ক্ষমতা ও পুষ্টি সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায় ।
জৈব আবর্জনা থেকে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোসার উৎপাদন কলাকৌশল	হজম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসিনা ফেটিডা (*Eisenia fetida*) জাতের কেঁচো গোবর ও রান্নাঘরের পচনশীল আবর্জনাকে ভর্মিকম্পোস্টে রুপান্তরিত করে। বাংলাদেশে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনকারী কম্পোস্টার কেঁচোর জাতগুলোর মধ্যে এসিনা ফেটিডা (*Eisenia fetida)* অধিক দ্রুততার সাথে বেশি পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে সক্ষম। এসব খেয়ে হজম প্রক্রিয়ায় কেঁচো যে মল ত্যাগ করে তাই ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার। অন্যান্য জৈবসারের তুলনায় এ সার অধিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ কারণ হজম প্রক্রিয়ায় উপকারী অণুজীব ছাড়াও কেঁচোর শরীর নিঃসৃত রস এটাতে মিশ্রিত থাকে যা এর পুষ্টিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সচরাচর গোবর দিয়ে এই সার তৈরি করা হয়। বর্তমানে গোবরের অপ্রতুলতায় ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে গোবর ও রান্নাঘরের পচনশীল আবর্জনার মিশ্রণ থেকে উৎপাদিত ভার্মিকম্পোস্ট বেশি পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ।
কেঁচো সার ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত প্রয়োগে বাধাঁকপি উৎপাদন	অনুমোদিত মাত্রা হইতে ২০% অজৈব সার ব্যবহার কমানো যাবে। কেঁচো সার বা ভার্মিকম্পোস্ট জমিতে প্রয়োগ করিলে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এতে মাটির উর্বরতা বাড়বে। এই সার মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক চরিত্রের মানোন্নায়ন ঘটায়। এই সার ব্যবহারে ফসলের আকার, গঠন ও স্বাদ ভালো হয় এবং ফসল সংরক্ষণের সময় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ফসলকে আরও বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়।

প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য
বায়োস্লারী ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত প্রয়োগে মিষ্টি মরিচ উৎপাদন	গরুর গোবর বা মুরগির বিষ্ঠা বায়োগ্যাস ডাইজেষ্টারের ভিতরে পরিপাক বা কোমলায়িত হওয়ার পর আউটলেট দিয়ে অর্ধতরল অবস্থায় বের হয়ে আসলে তাকে বায়োস্লারী বলে। বায়োস্লারী একটি অতি উন্নত মানের জৈব সার। তরল বায়োস্লারী শুকিয়ে জমিতে ব্যবহার করা হয়। বায়োস্লারী মাটির জন্যে একটি চমৎকার কণ্ডিশনার কারন এটা মটিতে জৈব পদার্থ ও হিউমাস সংযোজন করে এবং মাটিতে অনুজীবীয় কার্যাবলীকে সক্রিয় করে, ফলে মাটির উৎকর্ষতা এবং পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনুমোদিত মাত্রা হইতে ২৫% অজৈব সার ব্যবহার কমানো যাবে। বায়োস্লারী রোগজীবানুমুক্ত। বায়োগ্যাস প্লান্টে গোবর বা মুরগির বিষ্ঠা পরিপূর্ণ পচনের ফলে তার ভেতরে বিরাজমান রোগ-জীবানু মরে যায়। বায়োস্লারী প্রয়োগের মাধ্যমে মিষ্টি মরিচের অম্লতা ০.২৫ একক হ্রাস পায় ফলশ্রুতিতে ভিটামিন সি এর পরিমান ৩৫% বৃদ্ধি পায় মিষ্টি মরিচের মিষ্টতা ও অটলতা অনুমোদিত অজৈব সারের তুলনায় যথাক্রমে ৩০% ও ১২.৫% বৃদ্ধি পায় ।
ভূট্টা-মুগডাল-রোপা আমন ধান শস্য পর্যায়ের ফলন বৃদ্ধি ও মৃত্তিকা উর্বরতা রক্ষায় সমন্বিত পুষ্টি উপাদান ব্যবস্থাপনা	মৃত্তিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে উপরোক্ত পরিমানে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং গোবর সার ৫ টন/হেক্টর প্রয়োগ করলে ভূট্টা-মুগডাল-রোপা আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে ফসলের ভাল ফলন হয় এবং মাটির উর্বরতার মান উন্নয়ন করে। এক্ষেত্রে একবার অথবা দুইবার মুগের পড (ফল) তোলার পর মুগের গাছ মাটির সাথে চাষের মাধ্যমে মিশিয়ে দিতে হবে।

কম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতি

পিট পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরীর ক্ষেত্রে গর্ত বা পরিখার আকার: দৈর্ঘ্য - ৩ মিটার, প্রস্থ - ১.২ মিটার ও গভীরতা- ১.৩ মিটার হলে ভালো। পরিখার নীচে ৫ সে.মি. খড় গর্তের মাটিতে শোষনকারী উপাদান হিসেবে স্থাপন করতে হবে। কম্পোস্ট তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে খামারের আবর্জনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। জমে থাকা আবর্জনা ভালভাবে মিশ্রিত করে ২৫ সেন্টিমিটার পুরুত্বের একটি স্তর পরিখার দৈর্ঘ্য বরাবর ছড়িয়ে রাখতে হবে। এই স্তরটি ভালভাবে আর্দ্র করে এর উপরে ৫ সে.মি. গোবর দিয়ে এবং তার পরে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে বর্জ্যের কয়েক স্তর (২৫ সেমি পুরু) করে স্তুপটি মাটির স্তর থেকে ৪৫ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় না হওয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। উপরের অংশটি তখন একটি পাতলা মাটি বা গোবরের স্তর দিয়ে আচ্ছাদিত করতে হবে। ১৫ দিন পর পর মিশ্রনগুলো উলটপালট করে দিতে হবে । কম্পোস্টিং প্রক্রিয়াজুড়ে আর্দ্রতার মাত্রা প্রায় ৪৫% বজায় রাখা উৎকৃস্ট। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি যোগকরে এবং গর্তে কাংখিত আর্দ্রতার স্তর বজায় রাখতে হবে। যখন তাপমাত্রা ২১°C এর নীচে নেমে আসে এবং আর্দ্রতার পরিমাণ কমিয়ে ২০% এর নীচে আসে তখন কম্পোস্টিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ন হয়। প্রায় ৪-৫ মাস পরে এই কম্পোস্ট উপাদানগুলি যখন চা-য়ের পাতার মত বর্ণ ধারণ করে এবং ঝুরঝুরে হয় তখন জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্জ্য পদার্থগুলো ৫-৭ সে.মি. লম্বা টুকরো থাকবে। ৫ থেকে ৬ মাস পরে কম্পোস্ট জমিতে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হবে। ভাল কম্পোস্ট পাওয়ার জন্য বর্জ্যের প্রতিটি স্তরে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০০ গ্রাম টিএসপি সরবরাহ করা যেতে পারে। একইভাবে বিছানা পদ্ধতিতে স্তুপ আকারে কম্পোস্ট তৈরী করা যায়।

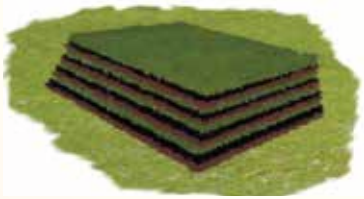

বিছানা পদ্ধতি

পিট পদ্ধতি

ভার্মিকম্পোস্ট তৈরীর পদ্ধতি

বাংলাদেশে, আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ অবশিষ্টাংশ সহ যথেষ্ট পরিমাণে জৈব বর্জ্য উৎপন্ন হয়। শহুরে এবং শিল্প বর্জ্যের সাথে কৃষিজ বর্জ্যগুলি প্রায়শই ভূমি ভরাটের কাজে ব্যবহার করা হয়, যা পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কেঁচো ব্যবহার পচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য লাভজনক ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন করতে পারে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অনন্য সমাধান হতে পারে। এই পদ্ধতিটি কেবল দূষণকে হ্রাস করে না বরং কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের মাত্রাকেও হ্রাস করে। পানি. গোবর. খড় সেড, মাটি বা বালি, মানসম্পন্ন ব্যাগ, কেঁচো, আগাছা বয়োমাস, একটি বড় বিন (প্লাস্টিক বা সিমেন্টের ট্যাঙ্ক), ধানক্ষেত থেকে সংগ্রহ করা শুকনো খড় ও পাতা, ক্ষেত এবং রান্নাঘর থেকে সংগৃহীত জৈব-পচনযোগ্য বর্জ্য ভার্মিকম্পোস্ট তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। বায়োমাস সংগ্রহ করে প্রায় ৮-১২ দিনের জন্য সূর্যের আলোতে রাখতে হবে। তারপরে, এটি পছন্দসই আকারে কাটারের সাহায্যে কেটে স্তূপাকারে রাখতে হবে। দ্রুত পচনের জন্য গোবর দিয়ে একটি স্লারি তৈরি করে স্তূপের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ট্যাংকের নীচে মাটি বা বালির একটি স্তর (২-৩ ইঞ্চি) দিতে হবে। আংশিকভাবে পচনশীল গোবর, শুকনো পাতা এবং মাঠ ও রান্নাঘর থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জৈব-পচনযোগ্য বর্জ্য একত্রিত করে সুন্দর বিছানা তৈরি করে ০.৫-১.০ ফুট গভীরতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ট্যাংকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিতে হবে। সমস্ত জৈব-বর্জ্য স্তরে স্তরে সাজানো হয়ে গেলে, কেঁচো প্রজাতিগুলিকে মিশ্রণে প্রবেশ করিয়ে শুকনো খড় বা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কম্পোস্টে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ট্যাংকটিকে পিঁপড়া, টিকটিকি, ইঁদুর, সাপ এবং সরাসরি সূর্যালোক থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এটিকে একটি সেড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অতিরিক্ত গরম হওয়া রোধ করতে এবং সঠিক আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার অবস্থা বজায় রাখতে নিয়মিত কম্পোস্ট নিরীক্ষণ করতে হবে।

কেঁচো সংগ্রহ

সিমেন্টের চাড়িতে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরী

ভার্মিকম্পোস্ট তৈরী

ভার্মিকম্পোস্ট প্রক্রিয়াজাত করণ

বায়োচার তৈরীর পদ্ধতি

জৈব পদার্থ হিসাবে বায়োচারের ব্যবহার মাটির জন্য অতুলনীয়। অক্সিজেন-সীমিত পরিবেশে বা পাইরোলাইসিস পদ্ধতিতে জৈব কঠিন বস্তু পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে পোড়ানোর ফলে বায়োচার তৈরী হয়। বায়োচারের ভৌত ও রাসায়নিক গুনাগুন নির্ভর করে ব্যবহৃত জৈব পদার্থের পানির উপস্থিতি এবং এর পার্টিকেল সাইজের উপর। এছাড়া ফিডস্টকের ধরন ও পাইরোলাইজড তাপমাত্রার উপর ও বায়োচারের ভৌত ও রাসায়নিক গুনাগুন নির্ভর করে। পাইরোলাইজড তাপমাত্রা কম থাকলে হাইড্রোজেন (H^+) আয়নের উপস্থিতি বেশি থাকে ফলে pH কম হয়। অপরদিকে পাইরোলাইজড তাপমাত্রা বেশি থাকলে হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নের উপস্থিতি বেশি থাকে ফলে pH বেশি হয়। এছাড়া বেশি তাপমাত্রায় বিভিন্ন মেটাল জাতীয় পদার্থ গ্যাস আকারে নির্গত হয়ে যায়। বিএআরআই উদ্ভাবিত বায়োচার তৈরীর ডিভাইসটির তিনটি অংশ- একটি বড় ড্রাম, একটি ছোট লক ড্রাম ও চিমনি। জৈব পদার্থ কক্ষ তাপমাত্রায় শুকানোর পর ছোট ছোট পিস করে ভিতরে রেখে ড্রামটি লক করতে হয়। অতঃপর ছোট ড্রামটি বড় ড্রামের ভিতর রেখে ভিতরের খালি অংশে লাকরি দিতে হবে। চিমনিটি বড় ড্রামের মুখে ঢেকে দিয়ে ড্রামের নিচের অংশের ছিদ্র দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হয় । প্রায় এক ঘন্টা আগুন রাখার পর ডিভাইসটি ঠান্ডা হলে ভিতরে রাখা ছোট ড্রামটি বের করতে হয় । উল্লেখ্য যে, বায়োমাসের ধরণ অনুযায়ী পাইরোলাইসিসের সময় কম-বেশী হয়। অতঃপর ছোট ড্রামটির লক খুলে যে কার্বন সমৃদ্ধ উপাদান পাওয়া যায় সেটাই বায়োচার। এ পদ্ধতিতে পাইরোলাইজড তাপমাত্রা ৩০০°-৮০০°C পর্যন্ত হয় । এছাড়া সিসিডিবি উদ্ভাবিত আখা নামক একটি জ্বালানী সাশ্রয়ী কৃষি বান্ধব চুলার মাধ্যমে আমরা বায়োচার পেতে পারি। এটি ন্যাচারাল ড্রাফট, গ্যাসীফায়ার চুলা। যাতে পাইরোলোসিস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই চুলায় সরাসরি বায়োমাস বা খড়ি না জ্বলিয়ে বায়োমাস থেকে উৎপাদিত গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে সীমিত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খড়ির গ্যাস জ্বলে বিধায় কম কার্বন নিঃসরন হয়। আখায় রান্নার সময় ৩০০-৮০০ °C তাপে পাইরোলোসিস প্রক্রিয়া চলে বিধায় বায়োমাস থেকে সৃষ্ট গ্যাস পুড়ানো হয় এবং বায়োমাসের কার্বন জমে থাকে যেটাকে বায়োচার বলে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে, কম কার্বন নিঃসরন করে,তাই গ্রীণহাউজ এর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।

বারি উদ্ভাবিত ড্রাম পদ্ধতিতে বায়োচার তৈরী

আখা কৃষি বান্ধব চুলা - ডিজাইন বাইইসলাম এবং উইনটার - ২০১৬

গোবর

খড়

লতাপাতা

কচুরিপানা

ডাস্টবিনের ময়লা

কাঁচাবাজারের ময়লা

কলাগাছ

গৃহস্থলি ময়লা

উপসংহার

জৈব পদার্থ মাটির গুণগতমানের সূচক যা মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মাটিতে জৈব পদার্থের স্তর সহজাতভাবে কম এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য উৎপাদনের চাহিদার কারণে কৃষিজমিতে চাপ বেশি ফলে মাটির জৈব পদার্থের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে এবং কৃষির পরিবেশগত প্রভাবকে ক্ষতিকর করে তুলতে পারে বিধায় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। টেকসই মাটির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা বজায় রাখতে এবং ফসলের ফলন আশানুরুপ রাখার জন্য মাঠপর্যায়ে মৃত্তিকা, পানি ও ফসল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। মাটির সম্ভাব্য পুষ্টির সরবরাহ এবং ফসলের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা জেনে পুষ্টির হার নির্ধারণ করার জন্য জৈব এবং অজৈব সারের সসন্বিত প্রয়োগ করা প্রয়োজন। উপরোক্ত মাঠ গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কতৃক উ ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ ব্যবহারে কৃষক একদিকে যেমন লাভবান হবেন অন্যদিকে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জৈব সারের অদর্শ মান দণ্ডঃ

উপাদান	সুপারিশকৃত মাত্রা
ভৌত গুণাবলী	
রং	গাঢ় ধূসর থেকে কাল
ভৌত অবস্থা	অ-দানাদার আকৃতির
গন্ধ	দুর্গন্ধ বিহীন
আর্দ্রতা	সর্বোচ্চ ১০-২০%
রাসায়নিক গুণাবলী	
পিএইচ	৬.০-৮.৫
জৈব কার্বন	১০-২৫%
মোট নাইট্রোজেন	০.৫-৪-০%
কার্বন ঃ নাইট্রোজেন	সর্বোচ্চ ২০
ফসফরাস	০.৫-৩.০%
পটাশিয়াম	০.৫-৩.০%
সালফার (গন্ধক)	০.১-০.৫%
জিংক (দস্তা)	সর্বোচ্চ ০.১%
কপার	সর্বোচ্চ ০.০৫%
আর্সেনিক	সর্বোচ্চ ২০ পিপিএম
ক্রোমিয়াম	সর্বোচ্চ ৫০ পিপিএম
ক্যাডমিয়াম	সর্বোচ্চ ৫ পিপিএম
লেড	সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম
মার্কারি	সর্বোচ্চ ০.১ পিপিএম
নিকেল	সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম
নিষ্ক্রিয় দ্রব্য	সর্বোচ্চ ১%

সূত্রঃ সার সুপারিশমালা হাতবই ২০১৮ , বিএআরসি

পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে
স্বয়ম্ভরতা অর্জনে নিবেদিত বি-এআরআই

প্রকাশ: অক্টোবর ২০২৩

Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০ কপি